মুক্তিযোদ্ধা ও সম্পাদকের বাইরে ভিন্ন আরেক মানুষ

চন্দন সরকার

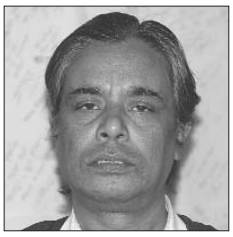

জাতীয় প্রেসক্লাবে শাহাদত চৌধুরীর (আমাদের শাহাদত ভাই) জানাজা। সর্বস্তরের অসংখ্য মানুষের ভিড়। তার সাংবাদিক জীবনের সহকর্মী, বন্ধুবান্ধব থেকে মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিঝরা দিনগুলোর সহযোদ্ধা আর নেই। তাই সবাই উপস্থিত। জানাজা শেষে কথা হচ্ছিল অনেকের সঙ্গেই। কেউ কেউ বলছিলেন, শাহাদতের পরিচয়ের গন্ডি বড় ছিল জানতাম। কিন্তু এতবড় যে ছিল তা জানা ছিল না।

শাহাদত ভাইয়ের পরিচয়ের গন্ডি বড় ছিল। তার জীবন যদি ভাগ করা হয় তা হবে তিন খন্ডে বিভক্ত। প্রথম খন্ড ছিল মুক্তিযুদ্ধের আগ পর্যন্ত। দ্বিতীয় খন্ড মুক্তিযুদ্ধ এবং তৃতীয় খন্ড তার পরের। প্রথম খন্ডে ছিল ছাত্রজীবন এবং সেই সুবাদে ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে জড়িত থেকে ষাটের দশকের সব আন্দোলনের নেপথ্য কর্মী। দ্বিতীয় খন্ডে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং ২ নম্বর সেক্টরে খালেদ মোশাররফের সহযোগী হিসেবে কর্মকান্ড এবং তৃতীয় খন্ডে সাপ্তাহিক বিচিত্রার কর্ণধার হিসেবে। কর্ণধার এ কারণেই যে, বিচিত্রায় তিনি সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগ দিয়ে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ও পরে সম্পাদক হয়েছিলেন। তবে এখানে তার পদ যখন যাই থাকুক না কেন, তিনিই ছিলেন সর্বেসর্বা। তারই পরিকল্পনায়, তারই নেতৃত্বে টিমওয়ার্কের মাধ্যমে বিচিত্রা প্রকাশিত হতো প্রতি সপ্তাহে।

শাহাদত ভাইকে খাপছাড়া চলনের জন্য অনেকেই ভাবতেন দারুণ অগোছালো বা বোহেমিয়ান। আসলে তিনি তা ছিলেন না। সদা ব্যস্ত সময় কাটানোর মধ্যেও তিনি ছিলেন পরিবারে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সদস্য। তাঁর মৃত্যুর পর যত লেখা বেরিয়েছে- সবই হয় মুক্তিযুদ্ধ, নয় সাংবাদিকতায় তার উজ্জ্বলতম স্বাক্ষরের কাহিনী। কিন্তু একজন পারিবারিক প্রধান হিসেবেও যে তিনি দায়িত্বশীল ছিলেন সে কথাটা উহ্য থেকেই যায়। পরিবার বলতে তার নিজের পরিবার থেকে বিচিত্রার সব কর্মীদের কথাও বলা যায়।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে বিচিত্রা প্রকাশিত হয়। আমি বিচিত্রায় যাতায়াত শুরু করি ১৯৭৪ সালের শেষের দিকে সাংবাদিক বিভাগের সতীর্থ মাহফুজ ভাইয়ের (মাহফুজউল্লাহ) সঙ্গে। যাতায়াতের মধ্য দিয়ে টুকটাক কাজ এবং সেই সুবাদে কিছুদিনের মধ্যেই বিচিত্রার একজন কর্মী (শাহাদত ভাই নিজেকেও তাই বলতেন) হয়ে যাই। বিচিত্রায় আমরা যারা কাজ করি তাদের সবারই বয়স তখন বিশের কোঠায়, এমনকি সবচেয়ে বড় শাহাদত ভাইয়ের বয়সও ত্রিশের নিচে। সারা দিনের কাজ শেষে অনেক দিনই আড্ডা বসতো শাহাদত ভাইয়ের টেবিল ঘিরে। কখনো তা অনেক রাত পর্যন্ত। শাহাদত ভাইয়ের কথায় মজা ছিল। এই আড্ডার মধ্য দিয়ে পত্রিকার পরবর্তী পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রসঙ্গও আলোচনা হতো। সেই সূত্রেই মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো থেকে তার আগের দিনগুলো সম্পর্কেও আলোচনায় এসে যেত। আলোচনা হতো অন্যান্য বিষয়ও। মূলত বিচিত্রায় আমরা যারা কাজ করতাম তারা একটা পরিবারের মতোই ছিলাম। আর এর মধ্যমণি ছিলেন শাহাদত ভাই। ফলে আমরা একে অন্যের হাঁড়ির খবরও জানতাম।

বিচিত্রা ও শাহাদত ভাইয়ের সাংবাদিকতা নিয়ে অনেক লেখাই লেখা হবে। কিন্তু একজন দায়িত্বশীল পরিবার, প্রধান হিসেবে তার যে অবদান, তাও কম ছিল না। ১২ ভাই-বোনের ষষ্ঠ ছিলেন তিনি। আমি কিন্তু শাহাদত ভাইয়ের বাসায় শাহাদত ভাইকেই বড় দেখেছি। শাহাদত ভাইকে তার ছোট ভাই-বোন (ফতেহ, মোরশেদ, রেজআলী, ঝিমলি ও ডানা) কেউ বলতো শাচো, কেউ বা সেজো, আবার কেউ বা সেজো ভাই। সবাইকে আগলে রাখতেন তিনি। যেন বাড়িতে না থেকেও তিনি সর্বত্র বিরাজমান। নিয়মিত বাজার করতেন তিনি। এমনকি কোন সিজনে কোন মাছ বা কোন তরকারি ভালো কিংবা কীসের সঙ্গে কোন সবজি ভালো মানায় তাও বলতেন তিনি। কারণ আলোচনায় বাজারদরের কথা উঠলেই কাঁচাবাজার থেকে মাছ, মাংস, চাল, ডাল, দুধ, তেলের দাম গরগর করে বলে দিতে পারতেন। যেমন একদিন আমাকে পরামর্শ দিলেন, বাজারের একটি ট্রিকস হচ্ছে যেকোনো সওদা (তা মাছ, মাংস, চাল, ডাল, শাকসবজি যাই হোক না কেন) নির্দিষ্ট কোনো লোককে বাছাই করে নেবে। প্রতিদিন তার কাছ থেকে সওদা কিনলে দাম হয়তো কিছুটা বেশি নিতে পারে কিন্তু কখনো খারাপ বা পচা জিনিস দেবে না।

অফিসে একটা ব্যাপারে তিনি ছিলেন বরাবরই উদার। টেলিফোনে কোনো মেয়ের সঙ্গে আলাপ করলে তিনি কনিষ্ঠদের বারণ করতেন না বরং উৎসাহ দিতেন। তবে বলতেন, অফিসের পিক আওয়ার বাদ দিয়ে। সদা হাস্যোজ্জ্বল মানুষটিকে অফিসে যেমন হালকা কথা দিয়ে সবার মন হালকা করতে দেখেছি, বাসায়ও দেখেছি তেমনই। ৩১ ডিসেম্বর ও পহেলা বৈশাখে শাহাদত ভাইয়ের বাসায় জমজমাট পার্টি হতো। এর আয়োজনের সব তদারকি করতেন তিনি। এমনকি কেনাকাটার লিস্ট তো বটেই, কেনাকাটাও করতেন। এসব পার্টিতে তিনি অদ্ভুত সব আয়োজনের ব্যবস্থা করতেন। একবার পহেলা বৈশাখের পার্টিতে ঠিক করলেন, বিচিত্রায় যারা বিয়ে করেছেন বা সংসার করেছেন তারা সবাই কমপক্ষে দুটি করে দেশী রান্নার আইটেম নিয়ে আসবেন। অথচ গিয়ে দেখি শাহাদত ভাই মাছ, মাংস ছাড়াও দেশী বিভিন্ন আইটেম করেছেন প্রায় ১৫টি। এরপর অন্য সবার আইটেম। সব মিলে প্রায় ২৫-৩০ পদের রান্না। সে এক এলাহী ব্যাপার।

এমনই অদ্ভুত মানুষ ছিলেন তিনি। ডাকসাইটে মুক্তিযোদ্ধা, সম্পাদক শাহাদত ভাইকে অনেকে জানেন, কিন্তু এমন পরিবারবৎসল ও অদ্ভুত মানুষকে কয়জন জানেন?

শ্রদ্ধা নিবেদনের শ্রাদ্ধ দিনে

খসরু চৌধুরী

সে সময়টায় বুয়েটের স্থাপত্যবিদ্যা বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র আমি। কার মাধ্যমে, আজ মনে নেই, একখানা সাপ্তাহিক হাতে পেলাম। নাম বিচিত্রা। তখন নতুন, পুরানো-পশ্চিমবঙ্গের দেশ, অমৃত প্রসাদ, উল্টোরথ, ঘরোয়া প্রভৃতি সাপ্তাহিক-মাসিকগুলোর লেখা গোগ্রাসে পড়তাম। স্বাধীনতার আগে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত সচিত্র সন্ধানী, ললনা, চিত্রালীর কিছু কিছু সংখ্যা পড়ার সুযোগ হতো। এর মধ্যে ললনা আমার মনে বিশেষ ছাপ ফেলেছিল। বিশেষ করে এর চিঠিপত্রের কলামটিতে।

বিচিত্রা হাতে নিয়েই একটু যেন ধাক্কা খেলাম। অন্যান্য সাপ্তাহিকের সাথে এর যেন মিল নেই। সে সময় স্বাধীনতার কিছু পর পর সাপ্তাহিক পত্রিকা বোধহয় ছিলই না, প্রায় সবই মাসিক। এই বিচিত্রাই বোধহয় সাপ্তাহিক। দেখলাম পত্রিকার ছাপা ভালো নয়, ছবিগুলোও খুব স্পষ্ট নয়। কিন্তু বিষয়-বৈচিত্রে সত্যিই বিচিত্রা। আগেকার বাংলা কাগজগুলো যা হাতে পেতাম, সেগুলো ছিল সাহিত্য, সিনেমা, বিনোদননির্ভর। বিচিত্রা ভর করেছে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক ঘটনাপ্রবাহের ওপর। প্রচ্ছদের লোগোতে অভিনবত্ব কিছু নেই, কিন্তু প্রচ্ছদপট প্রচলিত বাংলা সাময়িকীর লালিতে গড়া নয়, বরং ঋজু, নির্মেদ, কখনো নির্মম বাস্তবতার। বিষয়বস্তু- একটি বিষয়ভিত্তিক প্রচ্ছদ প্রতিবেদন, সাম্প্রতিক ঘটনাবলির বিবরণ, বিশ্লেষণ, খেলাধুলা, সিনেমা, কার্টুন ও একখানা গল্প। সাংবাদিকদের কাউকেই চিনতাম না বলে প্রিন্টার্স লাইন দেখার প্রয়োজন অনুভব করিনি। এর মধ্যে প্রচ্ছদে এসেছে বাংলাদেশের সদ্য উত্থিত গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন, তিতাস একটি নদীর নামের শুটিংয়ের বিবরণ, ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের কাহিনীসহ মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনা। অধিকাংশ মানুষের অজানা কিন্তু উৎসুক বাঙালি পাঠকের কাছে আধুনিক পৃথিবীর একটা রূপ আরোপ করে দিলো, বিচিত্রা যেটা বিজ্ঞানের মতো নিরাবেগ, অথচ সংবেদনশীল। পাকিস্তানি আমলের কোনো পত্রিকায় এমনকি পশ্চিমবঙ্গের কোনো পত্রিকায় সেটা সম্ভব হয়নি।

> আলোচনার কোনো আদি-অন্ত নেই। ব্রুক শিল্ড, সিন্ডি ক্রফোর্ড, বেন জনসন থেকে শুরু করে স্মিতা পাতিল, আদদান খাশোগী, মেরিলিন মনরো, স্টিফেন হকিন্স, হ্যামিংওয়ে থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ কিছু বাদ যেত না। সম্ভবত হ্যামিংওয়ে তাকে যতটা প্রভাবিত করেছিল আর কোনো লেখক তার ওপর ততটা ছাপ রাখেনি।

এর মধ্যে একটা কাণ্ড ঘটে গেল। বিচিত্রার প্রচ্ছদ প্রতিবেদন করেছে বাংলাদেশের নৃত্যশিল্পের ওপর। প্রচ্ছদপটে উঠে এসেছে আমাদেরই সহপাঠী নৃত্যরত লুবনা মারিয়ামের ছবি। মুক্তিযোদ্ধা লুবনা তখন দেশের ডাকসাইটে নৃত্যশিল্পী। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে তার নামভূমিকায় নৃত্যাভিব্যক্তি গুণীজন প্রশংশিত ও আপামরের স্বপ্নকন্যা হয়ে উঠেছিল। হাসিখুশি বন্ধুবৎসল লুবনা তখন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের হার্টথ্রব, কিন্তু আমাদের কাছে সে সহপাঠী-কাছের মানুষ। সে-ই কিনা প্রচ্ছদে উঠে গেল! সেই সংখ্যাটি বিচিত্রার পাঠক অনেক বাড়িয়ে দেয়। আমরাও পত্রিকাটি নিয়মিত পেতে থাকি, অজান্তে হয়ে ওঠে আমাদের পত্রিকা।

বিচিত্রা সমৃদ্ধির শীর্ষে ওঠে সম্ভবত '৭৭ সালের দিকে। আমাদের একটা ভয় ছিল দৈনিক বাংলা ট্রাস্টের সরকার নিয়ন্ত্রিত পত্রিকার পক্ষে বিচিত্রা কতটা স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে। কিন্তু দেখতে পেলাম নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার মধ্যেই বিচিত্রা তার পথ করে নিচ্ছে। বিশেষ করে এ সময় পত্রিকা কিছু কলাম প্রকাশ করে যেটা প্রচ্ছদের ওপরে পড়া চাপকে সামাল দেয়। উল্লেখযোগ্য কলামগুলো যা মনে পড়ছে- সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর ওপর কাঠামোর ভেতরেই, ফয়েজ আহমদের মধ্যরাতের অশ্বারোহী, সৈয়দ শামসুল হকের মার্জিনে মন্তব্য, খন্দকার আলী আশরাফের কলাম দুর্জন উবাচ, নিয়ামত হোসেনের প্যারোডি আর রনবীর জাতীয় চরিত্র হয়ে ওঠা ইনফ্যান্ট টেরিবল 'টোকাই'। বিচিত্রা ঈদ সংখ্যা বের করা শুরু করে। বিদগ্ধ লেখককুলের শ্রেষ্ঠ লেখাটি বিচিত্রা ঈদ সংখ্যার জন্য বরাদ্দ থাকতো। বিচিত্রা সরকারি পত্রিকা হয়েও বাম দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। সামরিক শাসককুলকে সেটা সহ্য করতে হয়েছে। কারণ অন্য পত্রিকাগুলো আওয়ামী লীগ প্রভাবিত। বিচিত্রা সরকারের উদ্দেশ্য সফলে সচেষ্ট না হলেও আওয়ামী লীগের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিল না। কতক ক্ষেত্রে বিরোধী ছিল। সেই থেকে আওয়ামী লীগ দৈনিক বাংলা ট্রাস্টের ওপর খেপে ছিল।

১৯৮৪ সালে ব্রিটিশ কাউন্সিলে আমি একটি একক আবৃত্তিসন্ধ্যা করি। অনেক পত্রিকায়ই অনুষ্ঠানের আগে-পরে অনুষ্ঠানটির ওপর লেখা হয়েছিল। বিচিত্রায় লেখা দেখতে চাই। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সুবাদে বিচিত্রার

নির্বাহী সম্পাদক শাহরিয়ার কবির, সহসম্পাদক চিন্ময় মুৎসুদ্দী, চন্দন সরকারের সঙ্গে সামান্য পরিচয় ছিল। দৈনিক বাংলা অফিসের তিন তলায় এসে মুনিরের খপ্পরে পড়লাম। পিয়ন মুনির লেখাপড়া তেমন জানতো না কিন্তু সম্পাদকের বাড়া। বিচিত্রার নতুন কর্মীরা, স্ট্রিংগাররা এই সম্পাদক বিশ্বস্ত বিচিত্রা অন্তঃপ্রাণ মুনিরের ধমকধামকে উৎকণ্ঠ থাকতো। শাহরিয়ার কবিরের পরিচিত বলে অল্পতেই ছাড় পেয়ে যাই।

শাহরিয়ার ভাইকে সব বললাম। বললেন, আগে বললে ভালো হতো। এখন কাকে পাঠাই। এক কাজ করুন। অনুষ্ঠানটি ক্যাসেটে ধারণ করে পাঠিয়ে দিন আমি কাউকে দিয়ে রিভিউ করিয়ে দেব।

ক্যাসেট পাঠানো হয়নি। দেশের প্রায় সবকটি পত্রিকায় সচিত্র রিভিউ বের হয়েছিল। তাতেই খুশি ছিলাম। বিচিত্রামুখো আর হইনি।

১৯৮৫ সালে পূর্ব-পশ্চিম সুন্দরবন ঘুরে এসে একটি বড় প্রতিবেদন তৈরি করে ছবিসহ 'রোববার' সম্পাদক শ্রদ্ধাভাজন কবি রফিক আজাদকে দিয়ে আসি। পরের সংখ্যাতেই সেটা ছাপা হয়। রফিক ভাই বললেন, তোমার লেখাটাই কভার স্টোরি করতাম কিন্তু শান্তিবাহিনীর একটি বড় দল আত্মসমর্পণ করায় ওটাকেই প্রচ্ছদ করলাম, তুমি লেখা দিতে থাক। পরপর কয়েকটি লেখা ছাপা হলো, কিন্তু তৃপ্ত হতে পারছি না। রোববারের সার্কুলেশন ততো নয়, বৃহৎ পাঠককুল বিচিত্রারসে মদালস। সার্কুলেশন ৪০ হাজারের ওপর। ভাবলাম আর একবার গুঁতো মারবো। '৮৮ সালের প্রথম দিকে সুন্দরবনের বাঘে মারার প্রবণতার ওপর একটি নিবন্ধ লিখে ছবিসহ একদিন বিচিত্রা অফিসে গেলাম। পরিচিত কেউ অফিসে নেই। চিফ রিপোর্টার কাজী জাওয়াদ অফিসে ছিলেন, আগে কখনো পরিচয় হয়নি। বললাম, আমি একটি লেখা নিয়ে এসেছি, আপনি যদি অনুগ্রহ করে শাহরিয়ার কবির সাহেবকে এটি পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন তা হলে ভালো হয়।

কিসের ওপর লেখা?

প্রতিপাদ্য জানালাম। বললেন, আমাদের খুলনা প্রতিনিধি আছে। তার কাছ থেকে সুন্দরবনের লেখা আমরা পাই। অন্য লেখা ছাপার অবস্থা নেই।

বিরক্ত হয়ে বললাম, আপনাদের স্থানীয় প্রতিনিধিরা বন অফিস পর্যন্ত ঘোরাফেরা করেন, এ লেখাটা জঙ্গলের ভেতর যেয়ে লেখা। আপনি শুধু শাহরিয়ার ভাইকে পৌঁছে দেবেন। ছাপা না ছাপা তার সিদ্ধান্ত। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে একজন পিয়ন ডেকে তিনি শাহরিয়ার ভাইয়ের লেখা রাখার বাক্সে

২০০১ সালে সাপ্তাহিক ২০০০ পরিবার নৌবিহারে

আমার লেখাটি ঢুকিয়ে দিতে বললেন। মুখে নিমপাতা গুঁজে বিচিত্রা অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম।

এক মাস চলে গেল। বিচিত্রায় আমার লেখা দেখতে পেলাম না। আমার লেখা ছাপানোর বেশ কিছু জায়গা তৈরি হয়ে গিয়েছিল ইতোমধ্যে। লেখাটি ফিরিয়ে আনতে একদিন বিচিত্রায় গেলাম। শাহরিয়ার ভাইয়ের কাছে লেখা ফেরত চাইতে জিজ্ঞাসা করলেন, কিসের ওপর লেখা? জানালাম। জমাট লেখার অনেকখানি তলা হাতড়ে আমার লেখাটি বের করে তখনই তিনি দুচারটি পাতা পড়ে ছবিগুলো দেখলেন। বললাম, এটি এখন রোববারে দেব। বললেন, না এটা তো বিচিত্রাতেই যাবে, বলে চন্দনদাকে লেখাটি এডিট করতে তখনই পাঠিয়ে চায়ের আদেশ দিলেন। পরের সংখ্যাতেই ছাপা হলো। ধন্যবাদ জানাতে বিচিত্রায় গেলে শাহরিয়ার ভাই বাঘ সংক্রান্ত আরো লেখা চাইলেন। একে একে ছাপা হতে থাকলো এ দেশে প্রথম বাঘ প্রকল্পের ওপর লেখা। রেডিও টেলিমিট্রির ওপর ও অন্যান্য প্রাণীবৈচিত্র্যের ওপর লেখা। কাজী জাওয়াদ ছাড়া সবার সঙ্গেই বন্ধুত্ব হয়ে গেল। কারো টেবিলে বসে এক কাপ চা আর একটু গল্প না করলে নাখোশ হন। এখানে হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না, আমার বাঘের পেছনে লেগে থাকার অন্যতম উৎসাহদাতা শাহরিয়ার কবির। সম্পাদক শাহাদত চৌধুরীকে দু-একবার দেখেছি সুচারু পোশাকে দৃঢ়পায়ে দ্রুত তার রুমটিতে হেঁটে যেতে। পরিচয় হয়নি, আগ্রহও বোধ করিনি। কারণ তিনি আসার সঙ্গেই একদল প্রতীক্ষমাণ চিত্রনায়িকা থেকে শুরু করে সমাজের নানা স্তরের হোমরা-চোমরারা তার কামরায় হামলে পড়তেন। অফিসের মধ্যে ডাক পড়তো শুধু শাহরিয়ার ভাইয়ের।

একদিন অফিসের মধ্যে তুমুল আড্ডায় বাংলাদেশ ক্রিকেট নিয়ে আলোচনা চলছিল। জিম্বাবুয়ে খেলতে আসছে। অক্টোবরে বাংলাদেশের পিচের অবস্থা কেমন থাকবে, সে সম্পর্কে কিছু একটা বলছিলাম বোধ হয়।

আসিফ নজরুল তখন বিচিত্রার নিয়মিত লেখক। বললেন এ কথাগুলোই আপনি লিখে দেবেন, চলুন শাহাদত ভাইয়ের কাছে। একরকম টেনেই নিয়ে গেল। দেখলাম মাঝারি ধরনের লম্বাটে একটি এয়ারকন্ডিশন রুম। মাঝখানে চেয়ারের মালা পরনো নিঃসঙ্গ একটি টেবিল। ওপাশে রিভালভিং চেয়ারে বসে শরীর এলিয়ে দিয়ে একমনে, একছন্দে, এক বিভক্তিতে কাগজ ছিঁড়ে চলেছেন দোহারা গড়নের ভারী চশমা পরা এক চোখের ঝুলেপড়া পাতা নিয়ে শাহাদত চৌধুরী। সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে টের পাওয়া যায় দামি ব্রান্ডের আফটার শেভের গন্ধ।

নজরুল পরিচয় করিয়ে বলল, উনি ক্রিকেট ভালো বোঝেন, এ লেখাটি উনি লিখলে ভালো হয়। শাহাদত চৌধুরী দ্রুত কথা বলেন। কথার দাড়ি, কমা, বা বাক্যের শেষ নেই। চা বিস্কুট খেতে খেতে যেটুকুন বুঝলাম তিনি আমার লেখা পড়েছেন। ঠাট্টা করে বললেন বাঘ দেখেছি কিনা। এ ঠাট্টাটি তিনি আমৃত্যু আমার সঙ্গে করে গেছেন। বললেন, লিখে ফেল। লিখলাম। ক্রিকেটার নান্নুকে কভারে রেখে সেটাই হলো বিচিত্রায় আমার করা প্রথম প্রচ্ছদ প্রতিবেদন।

এ লেখার পরপরই আমার সম্পাদকের দপ্তরে ঘন ঘন ডাক পড়তে থাকল। আলোচনার কোনো আদি-অন্ত নেই। ব্রুক শিল্ড, সিন্ডি ক্রফোর্ড, বেন জনসন থেকে শুরু করে স্মিতা পাতিল, আদদান খাশোগী, মেরিলিন মনরো, স্টিফেন হকিন্স, হ্যামিংওয়ে থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ কিছু বাদ যেত না। সম্ভবত হ্যামিংওয়ে তাকে যতটা প্রভাবিত করেছিল আর কোনো লেখক তার ওপর ততটা ছাপ রাখেনি। বাঙালি লেখকদের মধ্যে তার প্রিয় ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (দিবারাত্রির কাব্য), রবীন্দ্রনাথ (চার অধ্যায়) শরৎচন্দ্র (শেষ প্রশ্ন), প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত

কুমার সেনগুপ্ত, জগদ্দীশ গুপ্ত, সতীনাথ ভাদুরী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখরা। কবিদের মধ্যে অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শামসুর রাহমান, রফিক আযাদ, শহীদ কাদরী, আবুল হাসান, হুইটম্যান, মায়াকোভিস্কি প্রমুখরা।

তবে হ্যামিংওয়ে ছিলেন একেবারে শীর্ষে। পিতার চাকরির কারণে তার শৈশব ছিল কিছুটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে। এর মধ্যে তার বন্ধু হয়ে যান শেখ আবদুর রহমান। সে প্রচুর বই কিনতো, কিশোর শাহাদতকেও পড়তে দিতো। তখন শাহাদতের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল বই আর সংলাপ রেকর্ড সংগ্রহ করা। হেডেন, মোৎসার্ট, বিতোফেনের ধ্রুপদী রেকর্ডের সঙ্গে তিনি বিটেলসের রেকর্ডও শুনতেন।

হ্যামিংওয়ে হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখতেন তিনি। আফ্রিকার বন্য উদ্দাম শিকারি জীবন, সুন্দরী রমণী সান্নিধ্য, কিউবার সামুদ্রিক জীবন, স্পেনের ফ্যাসি বিরোধী জড়ো হওয়া সৈন্যদলে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করা। এসব তাকে পাগলাপারা করে তুলেছিল। এমনি জীবন উপভোগের সুযোগও তিনি পেয়ে গিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় আগরতলার মেলঘরে ২ নম্বর সেক্টরের আরবান গেরিলা দলের সমন্বয়কারী হন তিনি। একদিকে উন্মূল উদ্বাস্তু মানুষদের অনিশ্চিত যাত্রা, অন্যদিকে একদল যুবক-যুবতীর দেশমুক্ত করার মৃত্যুঞ্জয়ী বাসনা দেখেছিলেন তিনি। সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফের অন্য কাছের মানুষ ছিলেন। অপারেশন নিয়ে মাঝেমধ্যেই কথা কাটাকাটি হতো, স্ট্র্যাটিজিক প্লান শেষ হতো বুকে বুক মিলিয়ে। তার সহযোদ্ধারা কেউ কারো চেয়ে পিছিয়ে ছিলেন না। শহীদুল্লাহ খান বাদল, হাবিবুল আলম, নাসিরউদ্দীন ইউসুফ, রাইসুল ইসলাম আসাদ, রুমী, সুবেদার ওয়াহাবসহ যার যার ক্ষেত্রে কিংবদন্তির মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। সুবেদার ওয়াহাব ছাড়া অন্যরা তার চেয়ে বয়সে কিছুটা জুনিয়র ছিলেন। এরা তার আমৃত্যু বন্ধু ছিলেন। এসব কথা শুনতাম তার ছোট ঘরটিতে বসে। সিগারেটের উদ্বায়ী ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার হয়ে আমরা যেন চলে যেতাম সেই সালদা নদীর পাড়ের রণক্ষেত্রে, মেলঘরের ফিল্ড কমান্ডারের তাঁবুতে, যেখানে প্রিয় সঙ্গীদের 'শাহাদত চৌধুরী অথবা 'বুইরা' তাদের ঢাকায় পাঠানোর আগে চোখের চশমাটা মুছে নিতেন।

১৯৮৯ সালের শেষে দিকে বেসরকারি পর্যটন সংস্থাগুলোর বিকাশ নিয়ে একটি প্রচ্ছদ প্রতিবেদন করার কথা বললাম। অচল পণ্যের সচল করার স্বপ্ন দেখানোর সওদাগর সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাবটি লুফে নিলেন। বললাম, গাইড ট্যুরস নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে, এর প্রধান কর্মকর্তাও একজন স্বপ্নদ্রষ্টা, একে কেন্দ্র করে কাজটা করি।

লোকটার নাম কি?

হাসান মনসুর

বাদ দাও, সব মনসুর টনসুর, শোন নায়লার কাছে শুনেছি। কি একটা নাম যেন... এ নাকি সেবা প্রতিষ্ঠানের মর্ম বোঝে। সে নিজেই নাকি অতিথিদের মালামাল টেনে দেয়। এমন মানুষই আমার দরকার। দাঁড়াও ফোন করে দেখি নায়লাকে। ফোন হলো। ভদ্রলোকের নাম পাওয়া গেল- মিলন।

বললাম, হাসান মনসুরেরই ডাকনাম মিলন।

তাই নাকি! তা হলে মিলনকেই ফোকাস করে পর্যটনের বিকাশ নিয়ে লেখ। লেখাটি প্রকাশিত হয় নবেম্বরের প্রথম। বেশ সাড়া পড়ে। গাইডের নাম ছড়িয়ে পড়ে। আমি গাইড পরিবারের অতি ঘনিষ্ঠ। খুশি হয়ে হাসান মনসুর ঠিক করলেন বিচিত্রা পরিবারকে নিয়ে তাদের সদ্য নির্মিত নৌকা রূপসীতে রাত কাটাবেন। বিচিত্রা পরিবার বেশ বড়। অগত্যা শাহাদত ভাই তার বন্ধুদের নিয়ে দুপুরে রূপসীতে উঠে বসলাম। আমি ছেঁড়ার জন্য শাহাদত ভাইয়ের জন্য কিছু কাগজ নিয়ে গিয়েছিলাম। বললেন, ওসব লাগবে না। দেখ না কী করি।

অপরিচিতদের কাছে শাহাদত চৌধুরী স্বভাব-লাজুক মানুষ। সহসা কারো সঙ্গে পরিচিত হতে চাইতেন না। কিন্তু বন্ধুসমাগমে পুরোপুরি এক্সেট্রোভার্ট। সেই রাতে উপস্থিত ছিলেন টিটো ভাই (মাহফুজ আনাম), সেলিনা ভাবী, সাশা বাচ্চু ভাই, বাদল ভাই, নায়লা আপা, শিমুলভাবী, শ্যাল ভাই প্রমুখরা। গাইডের পক্ষ থেকে মিলন ভাই, তপুভাবী, মিতু, রুবাই। সন্ধ্যার আগেই পূর্ণিমার চাঁদের আলো দখল নিয়ে নিলো। সন্ধ্যার পর বোট ভিড়ানো হলো রূপগঞ্জ ছাড়িয়ে একটা বিরানা চরে। শ্যাল ভাই স্টিফেন হকিংয়ের কৃষ্ণগহ্বরে আমাদের নিয়ে চলেছিলেন আলোক হাতে। শাহাদত চৌধুরীর বেড়াতে এসে এতো তত্ত্বকথা শোনার সময় নেই। তার সান্নিধানে তিনিই মধ্যমণি। নায়লা আপাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, চল পানিতে নামি, দেখ কে কে নামবে। মিলন ভাই, তপুভাবী আর এক কাঠি এগিয়ে, তারা একটি ছোট নৌকায় আগেই ভেসে গিয়েছিলেন। সবাই তীরে নামলাম, কিন্তু পানিতে নামলাম মাত্র চারজন। শাহাদত ভাই, বাদল ভাই, নায়লা আপা আর আমি। নায়লা আপা জলের পোকা। সহপাঠিনী লুবনার বড় বোন। তার সঙ্গে পরিচয় হয় পঁচাত্তরের জানুয়ারি মাসে অধ্যাপক সতীশ বাহাদুরের ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশনের কোর্সে। তখনকার নায়লা এহমার জামান রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী, হবু ডাক্তার, নাগরিকের বাকি ইতিহাস নাটকের ডাকসাইটে অভিনেত্রী। আর বাদল ভাই অবিচল সদা হাস্যময় এক স্বরাট মানুষ। কী কারণে জানি না, এরা দুজনই আমাকে প্রচণ্ড স্নেহ করেন, পরবর্তীতে আমার স্ত্রী শিউলীর স্নেহের ভাগীদার হয়ে পড়েন। শিউলীর মতে, এরা বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ জুটি ভয়ে ভয়ে তার কথায় আমিও সায় দিই। শাহাদত চৌধুরীকে দেখলাম নায়লা-বাদলের কথার ওপর আর কোনো কথা নেই। এদের শিক্ষা মননের প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস।

সাঁতার কাটতে কাটতে ক্লান্ত হয়ে শাহাদত চৌধুরী পাড়ে হাঁপাচ্ছেন। আমাকে ডেকে নিয়ে নদীর তীরধরে কিছু এগিয়ে অর্ধেক শরীর জলে ডুবিয়ে তার চশমাটা রাখতে বললেন। তারপর তাকে কাদা মাখাতে বললেন। শুধু সুইমিং কস্টিউম পরা, তার ওপর চাপ চাপ কাদা লাগালাম। বললেন, তুমি কাচুমাচু মুখে ওদের গিয়ে বল শাহাদত চৌধুরী পাড় দিয়ে হেঁটে কোথায় যেন চলে গেছেন। তাই করলাম।সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে খুঁজতে লাগলেন। মাটিতে শোয়া জলের ধারে শাহাদত চৌধুরী পেতে কষ্ট হলে না তাদের। কিন্তু ঐ অবস্থায় একটা লাশের অস্তিত্ব দেখে অনেকেই আঁতকে উঠলেন। শাহাদত ভাই নট নড়ন চড়ন। মানুষটি সত্যিই শাহাদত চৌধুরী কিনা সেটাও সবার কাছে স্পষ্ট নয়। এই নিয়ে যখন ভয়ার্ত আলোচনা চলছে, শাহাদত চৌধুরী ধীরেসুস্থে উঠে বললেন, তোমাদের সত্তরের মনপুরা দেখলাম।

ততদিনে বিচিত্রায় গল্প প্রকাশ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে রাতে খানাপিনার পর শাচৌকে চেপে ধরেছিলেন তপতী মনসুর, গল্প কবিতা বন্ধ করেছেন।

আমি একটা নিউজ ম্যাগাজিন তৈরি করেছি, আমি চাচ্ছি বাঙালির মাথার ওপর থেকে 'দেশ'-এর ভূত নামাতে, শাচৌয়ের উত্তর।

১৯৯০ সালে বিশ্বকাপ ফুটবলের আসর বসল। বিশ্বকাপ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় অধিকাংশ লেখার প্রচ্ছদপট লিখেছি আমি। ক্রিকেট আমার প্রিয় খেলা, ফুটবলের মতো গা-ঠোকাঠুকির খেলা খুব একটা পছন্দ করি না। কিন্তু শাহাদত ভাই সারাক্ষণ সঙ্গে থাকতেন, অসম্ভব ফুটবলপাগল, তার আদেশ এড়ানো গেল না। এমনিতে শাহাদত ভাই সিরিয়াস মানুষ, কিন্তু কেউ তার ঠাট্টার পাল্লায় পড়লে তার প্রাণ ওষ্ঠাগত। এ সময়টা মেজাজ থাকতো

ফুরফুরে। ঘন ঘন সিগারেট টানতেন, আর হাওয়া থেকে রস বের করে আনতেন, কখনো তা শ্লীলতার সীমানা ছাড়াতো, কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক হতো না। সারা দিন আনন্দ বিচিত্রা অফিসে অস্থায়ী ফুটবল লেখার আসরে বসে লিখতাম, রাতে খেলা দেখতাম। সেমিফাইনাল থেকে নায়লা আপাদের বাড়িতে শাচৌসহ সবাই।

বিএনপি ক্ষমতায় আসার কিছুকাল পর ঘাতক দলাল নির্মূল কমিটির অন্যতম উদ্যোক্ত শাহরিয়ার কবিরকে বিচিত্রা ছাড়তে হলো। প্রকৃতপক্ষে সে সময় থেকেই বিচিত্রা তার চাকচিক্য হারাতে থাকে। শাহরিয়ার কবির শক্ত হাতে বিচিত্রা মান বজায় রাখতেন, দুজনে মিলে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতেন। সেটা নষ্ট হলো। প্রাণিবৈচিত্র্য, সুন্দরবন নিয়ে লেখাগুলো শাহরিয়ার ভাইয়ের উৎসাহে লিখেছিলাম। তিনি চলে যাওয়ায় আমার আগ্রহও কমতে থাকে।

ব্রাজিলের রিও-ডি-জিনেরোতে বিশ্বপরিবেশের উপর সম্মেলন হতে চলেছে। শাহাদত চৌধুরী সেখানে যাবেন। আমাকে ডেকে বললেন, বাংলাদেশের যে সমস্ত পাখি, জীবজন্তু বিলুপ্ত ও বিলুপ্তপ্রায় তার উপর একটি বিশেষ প্রতিবেদন লেখ। লেখাটি বেশ তথ্য অনুসন্ধান করে লিখেছিলাম। ভালো সম্মানীও পেলাম। রিও থেকে ফিরে আসার পর আড্ডার মুহূর্তে জিজ্ঞাসা করলাম, লেখাটিতে আপনি প্রাণিবিদ্যার কোনো অধ্যাপককে দিয়ে লেখাতে পারতেন, আমার মতো অপেশাদার প্রকৃতিবিদ বেছে নিলেন কেন?

চোখে বুজে হাসিমুখে বললেন, বল কেন?

তারপর নিজেই উত্তর দিলেন, তোমাকে সময় দিয়েছিলাম পনেরো দিন। কোনো অধ্যাপককে দিলে দু'মাস লাগতো। আর তুমি বিষয়টি নিয়ে বর্তমান সময়ে নাড়াচাড়া করছে। অধ্যাপককে আমাকে দিতে হতো অন্তত দশ হাজার টাকা, তোমাকে দিয়েছি সাড়ে তিন হাজার। কি লাভ করিনি?

দেশের ডাকসাইটে সুন্দরী কিন্তু বুদ্ধিমতিদের অনেকেই ছিলেন শাচৌয়ের বন্ধু। শাহরিয়ার কবির ভাই চলে যাবার পর বিচিত্রায় গেলেই সম্পাদকের রুমে ঘন ঘন ডাক পড়তো। তখন কোনো এক তন্ময় মুহূর্তে শুনতাম নারী-বন্ধুদের কাহিনী। ববিতার পরিমিতিবোধ, ফারহানা হকের বুদ্ধিমত্তা, সুরাইয়া খানমের তীব্র আবেগের নানা কথা শুনতে পেতাম। কিন্তু প্রত্যেকের সম্পর্কে তার উল্লেখ ছিল শ্রদ্ধার, কারও অবমাননা করতেন না।

সুলতানা কামাল, লায়লা জামানদের উল্লেখ করতেন অনেক পুরুষ বন্ধুদের সম্বন্ধে আলোচনার মতো করে। তিনি হেমিংওয়ের মতো তামসিক ছিলেন না, নারীসঙ্গ চাইতেন, কিন্তু বুদ্ধিমতি ধীমতিদের মধ্য থেকে। তার পিপাসা ছিল ইনটেলেকচুয়াল রোমান্সের।

১৯৯৪ সালে সবান্ধব শাহাদত ভাইসহ সুন্দরবনে যাই। লায়লা আপা, বাদল ভাই, লুবনা, বাচ্চু ভাই, শিমুল ভাবী, ইয়াসমিন আপা তার স্বামী, কন্যাসহ, সাদিয়া, শিমু আপা, মাহফুজ ভাই কন্যাসহ সস্ত্রীক সাশা, এষা, সেলিনা ভাবী মিলে চারটা দিন শাহাদত ভাই সবাইকে মাতিয়ে রাখেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সবাই বোট থেকে জঙ্গলে থামলেও কচিখালীর সমুদ্রসৈকত ছাড়া শাচৌ কোথাও নামেননি। আমাকে বললেন, কি ধরনের জঙ্গল এটা, একটা হরিণ দেখতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় আর আফ্রিকার বনে দেখেছি হাজার হাজার জেব্রা, নু কোথাও সিংহের দল, আর হ্রদের মধ্যে লাখ লাখ ফ্লেমিংগোর ঝাঁক আর মাসাই মেয়েগুলোর...

বুঝতাম হেমিংওয়ে এখানে এসে ঠোক্কর খাচ্ছেন। অবারিত প্রান্তর এখানে নেই, নেই উদ্দাম জীবনের উন্মাদনা।

৯৫/৯৬ সালের দিকে বিচিত্রা অনেকটা জৌলুস হারিয়ে ফেলে। এর মধ্যে আমার বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত লেখাগুলো ফিলার হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকায় বিরক্ত হই। একটি লেখা ছাপা না হবার কারণ শাহাদত ভাইকে জিজ্ঞাসা করলে বলেন, ওসব বাদ দাও, তোমাকে অ্যাসাইমেন্ট দিচ্ছি একটা কভার স্টোরির... আমি সবিনয়ে করব না বলে চলে আসি বিচিত্রা থেকে। আর কোনো দিন বিচিত্রামুখো হইনি।

বিচিত্রা আরো কিছুকাল চলেছিল। তারপর দৈনিক বাংলা ট্রাস্টই গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকার তুলে দিয়ে এতো বছরের বিচিত্রাবিরোধী ক্ষোভটা মেটায়। সেটাকে আরো পাকা করে বিচিত্রা নামে পত্রিকা প্রকাশের অনুমতি পান তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভগ্নি শেখ রেহানা।

১৯৯৯ সালের এক সকালে আমার গুলশানস্থ হাইড আউটে ফোন আসে। অপরপ্রান্তে শাহাদত ভাই। কি করছ? এখনই চলে আস।

'গতরাতে পেটের ওপর ধকল গেছে, ভরসা করতে পারছি না।'

'শোন ঠিকানা বলছি আটাশ নম্বর রোড ধানমন্ডি... এখনই এসে পড়, দরকার হলে পেছনে ছিপি লাগিয়ে...

ধানমন্ডির ২৮ নম্বর রোডের দোতলা বাড়িটার দোতলায় এলাম। প্রথম রুমটাতেই বন্ধুবর অরুণ চৌধুরী বসেন। বন্ধুবর অরুণ সহাস্যে বলে উঠল কংগ্রেটস্।

কিসের জন্য?

আপনি সাপ্তাহিক ২০০০-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর হিসেবে জয়েন করেছেন সেজন্য।

আমি তো এর কিছুই জানি না।

যান শাহাদত ভাইয়ের রুমে, জানতে পারবেন।

রুমে ঢুকেই পরিতৃপ্ত শাহাদত ভাইয়ের মুখ দেখতে পেলাম। মিটি মিটি হাসছেন। কি শক্‌টা কেমন হলো?

শক্ কাটিয়ে উত্তরও দিতে পারছি না। শোন নতুন পত্রিকা শুরু করেছি। শাহরিয়ার, চিন্ময় এরা সবাই নানা জায়গায় প্রোভাইড হয়ে গেছে। অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর কাকে করি, অরুণ তোমার নাম প্রপোজ করলো। সবাই সম্মত হলো। তোমাকে এতো টাকা দেয়া হবে। আর কতোদিন গুলশানে বসে বড়লোকের মনোরঞ্জন করবে। তাই তুমি এখানেই জয়েন করেছ। এখানে তোমার পরিচিত বিচিত্রার একমাত্র মন্টি আছে, সে চিফ রিপোর্টার। আজই কাজে লেগে যাও।

শুনতে পেলাম বিচিত্রা লুপ্ত হবার পর সবাই চলে গেলেও আদনান, মোর্তোজা, মন্টি তাকে ছেড়ে যায়নি। এরা প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় শাহাদত ভাইয়ের বাসায় যেয়ে নতুন পত্রিকা- অবয়ব নির্মাণ করেছে। পত্রিকা বের করছে মিডিয়া ওয়ার্ল্ড, ডেইলি স্টার এবং হবু প্রথম আলোর কর্তৃপক্ষ।

অনেকটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। ব্যক্তিমালিকানার কারো পক্ষে শাচৌকে ধারণ করা সম্ভব নয়।

ধানমন্ডি ২৮ নম্বর বাড়িতে মাস তিনেক কাটিয়ে আমরা ৪৭ নিউ ইস্কাটনে চলে আসি। এর দু'মাস পর পত্রিকা বের হয়। পত্রিকা ৬৪ পৃষ্ঠার, বিচিত্রা ছিল ৩২ পৃষ্ঠার। সেখানে বিজ্ঞাপন থাকতো প্রচুর, এখানে নেই বললেই চলে। বিচিত্রার লেখকদল ছিল বিরাট, এখানে সে বলে ঘাটতি। কথাটা বললাম শাহাদত ভাইকে। বললেন, দেখ না কি করি।

বিভাগগুলো ভরাতে, নতুন লেখকদের বোঝাতে, কপি এডিট করতে মন্টি আর আমাকে হিমশিম খেতে হতো। দু'হাতে লিখতেও হতো। বিনোদন বিভাগ আর বিদেশী পাঠকের চিঠিপত্র বিভাগ ছাড়া সব বিভাগেই লিখেছি। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় শাহাদত ভাইয়ের প্ররোচনায় ভায়াগ্রার ওপর একটি লেখা লিখেছিলাম। প্রকাশের পর শাহাদত ভাই ডেকে বললেন, শোন তোমার লেখা পড়ে বাদল কি বলেছে, বলেছে, এতো প্রমিত বাংলায় এমন অশ্লীল কথা লেখা যায়, আমার ধারণায় ছিল না। হাসবো না কাঁদবো বুঝতে পারছিলাম না। নাটের গুরু মৃদু মৃদু হাসছেন। এর মধ্যে মন্টি ও মোর্তোজার তদন্ত প্রতিবেদনগুলো বেশ সাড়া ফেললে

পত্রিকার কাটতি বাড়তে থাকে। আনন্দধারাও প্রকাশিত হয়েই বাজার দখল করে বসে। আমার সুন্দরবনে যাওয়া বন্ধ। শাহাদত ভাই ছাড়তে চান না। কাজে মন বসাতে পারি না। ২০০০ সালে বিয়ে করি। লুৎফর রহমান রিটন আর আসিফ নজরুল ছিলেন ঘটক। কনে এবং বরপক্ষের মধ্যস্থতাকারী শাহাদত চৌধুরী।

একদিন ডেকে বিবাহিত জীবন সম্পর্কে, এর আনন্দময় দিক, টানাপড়েন বোঝালেন। ওঠার সময় বললেন, শোন কালই দাঁত স্কেল করিয়ে নেবে।

মনে পড়ে সেই '৮৯ সালে বেন জনসনের ৯ সেকেন্ডে ১০০ মিটার দৌড়ের সাফল্যে, ক্যামেরুনের আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে জয়ে শাহাদাত ভাই কেঁদে ফেলেছিলেন। বলেছিলেন, দেখ মানুষ কি না পারে, কী অপরাজেয় তার শক্তি।

সাপ্তাহিক ২০০০-এও দেখতে পেতাম অপরাজেয় শাচৌকে। দিনে দিনে ব্যাধি তাকে জড়িয়ে ফেলছে, অথচ কোনো দিন ব্যাধিকে অজুহাত করেননি।

বাংলাদেশে নতুন ব্যবসায়, শিক্ষা, কৃষি বুটিক, মডেল, পণ্য বিপণনের পথিকৃৎ শাহাদত চৌধুরী, তেমনি তরুণ সম্প্রদায়ের স্বপ্নের কাছাকাছি তিনি পৌঁছেছিলেন। একটি জেনারেশনকেই বলা চলে বিচিত্রা জেনারেশন। কিন্তু বিচিত্রার জাবর কাটতে মোটেই পছন্দ করতেন না। সাপ্তাহিক ২০০০ মোটেই বিচিত্রা নয়। বরং প্রাগ্রসর।

শাহাদত চৌধুরীর ব্যক্তিত্বের গড়ন কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের। তবে যেটা করতে চাইতেন করতেন। একদিকে তিনি ছিলেন উদারনৈতিক বুর্জোয়া, মধ্যবিত্তই ছিল তার ভরসার স্থল- চেয়েছিলেন নতুন সময়ের উপযোগী শক্ত প্রভাবশালী মধ্যবিত্ত গড়ে উঠুক, যার মূল্যবোধ তৈরির তিনি একজন কারিগর। অন্যদিকে বিপ্লবী রোমান্টিক ভাবালুতাও তার ছিল, সি-গেভারা, হ্যামিংওয়ে মাথায় নিয়ে তিনি মাসুদ রানাও লিখেছেন। আরো একদিকে তিনি ছিলেন প্রখর ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী এরিস্ট্রোক্যাট। সোভিয়েট ইউনিয়ন ভাঙার পর তার বিশ্বাসের নিগঢ়গুলো নাড়া খেয়ে যায়। কোনো কিছুতেই তার এ্যাবসলিউট বিশ্বাস ছিল না, ঈশ্বরেও না; নির্মাণ করতে পছন্দ করতেন। শাহাদত চৌধুরীর মতো জঘন্য প্রভাবশালী মানুষকে কেউ কখনো বিদায় জানাতে পারবে না, চেষ্টা করেও না; এই রক্তবীজ অনশ্বর, শুধুমাত্র সঞ্চারিত হতে জানে।

যিনি স্বপ্ন দেখতে দেখাতে জানতেন

আশরাফ কায়সার

যে মানুষটা অন্ধকারে খাঁ খাঁ সীমান্তে ছুটে বেড়াতেন দেশের মুক্তির সংগ্রামে, গেরিলাদের সংঘবদ্ধ করছেন, তাঁর হাতে তখন নেই রঙতুলি, আছে রাইফেল। তাঁর সৃষ্টিশীলতা তখন জলরঙে আঁকা বাংলার প্রকৃতি নয়, স্বাধীন বাংলাদেশের মানচিত্র অংকনে।

সেই মানুষটা স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে শরতের শেফালীর এক বুক গন্ধ নিয়ে পূর্ণতা পেয়েছিলেন। চাননি মুক্তিযোদ্ধা বলে চিহ্নিত হওয়ার বাড়তি সুযোগ কিংবা বীরত্বের অযথা গল্প।

তিনি জানতেন দেশ স্বাধীনের চেয়ে অনেক কঠিন দেশ গড়া। আর তাই স্বাধীন দেশের বিশুদ্ধ বাতাস বুক ভরে নিয়ে শুরু করেন নতুন যুদ্ধ- সাপ্তাহিক বিচিত্রার মাধ্যমে। ২ নং সেক্টরের মেলাঘর থেকে ১ নং ডিআইটি এভিনিউ। যুদ্ধের রণাঙ্গন থেকে মানুষের মুক্তির লড়াইয়ে।

আমার কাছে তিনি স্বপ্নের ফেরিওয়ালা। **শাচৌ বলতেন ভবিষ্যতের কথা। কী করে দেশের সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকা আরেকটু ভালো করা যায়, রাজনীতির কোন্দল কমিয়ে সুশাসন আনা যায়, অর্থনীতি কিভাবে আরো ভালো হতে পারে এসব নিয়ে সুস্পষ্ট ধারণা রাখতেন তিনি।**

পেইন্টার, মুক্তিযোদ্ধা, সংগঠক, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অগ্রণী শাহাদত ভাইয়ের আরো অনেক পরিচয় আছে বটে। তবে আমার কাছে তিনি স্বপ্নের ফেরিওয়ালা। যিনি স্বপ্ন দেখতে ও দেখাতে জানতেন।

সেদিন দেখলাম ব্ল্যাক ছবিটিতে একটি দৃষ্টিহীন মেয়ে উচ্চকণ্ঠে ক্লাসের সহপাঠিদের বলছে- কে বলেছে, আমি দেখতে পাই না। চোখ তো দেখে না, দেখে মন। কথাটি শাচৌ'র মুখে শুনেছি অনেকবার, অনেকভাবে। বিচিত্রার ছোট্ট ঘরটিতে বসে শাচৌ আমাদের, যারা বিচিত্রায় কাজ করতাম, নিয়ে যেতেন একাত্তরে শালদা নদী, খালেদ মোশাররফ, সুবেদার ওহাব, মেলাঘর, ঢাকায় গেরিলা অপারেশন। বলতেন মুক্তিযুদ্ধের সে সব হিরন্ময় দিনের কথা। কখনো দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে, কখনো চোখ বন্ধ করে। এক সময় চোখের কোণে জমতো কয়েক বিন্দু কান্নার অশ্রু। সবার অলক্ষ্যেই মুছে ফেলতেন তা।

শাচৌ বলতেন ভবিষ্যতের কথা। কী করে দেশের সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকা আরেকটু ভালো করা যায়, রাজনীতির কোন্দল কমিয়ে সুশাসন আনা যায়, অর্থনীতি কিভাবে আরো ভালো হতে পারে এসব নিয়ে সুস্পষ্ট ধারণা রাখতেন তিনি। আর তাই সত্তর দশকেই বিচিত্রার প্রচ্ছদে উঠে আসে জনশক্তি রপ্তানির মতো আধুনিক

ধারণা। গ্রাম পর্যায়ের অবস্থা জানাতে দশ বছর পরপর লেখা হয়- 'বাংলাদেশ একটি নাম, লক্ষ গ্রাম। নীতি নির্ধারণে আয়োজন করা হয় গোলটেবিলের। স্বচ্ছ ধারণা নিয়ে জন্ম নেয় ফ্যাশন কিংবা ফটোসুন্দরীর মতো নাগরিক বিষয়গুলোর।

শাহাদত ভাই ছিলেন আগাগোড়া একজন আধুনিক মানুষ। তার জীবনযাপন, কথা বলার ভঙ্গি, বিষয়ের অবতারণা, অন্তর্দৃষ্টি সব কিছুতেই ছিল সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকার ছোঁয়া। আর তাই বয়সের ব্যবধানকে আমলে না নিয়ে তরুণদের সঙ্গে তিনি মিশে যেতেন অনায়াসে। শাহাদত ভাইয়ের প্রবল আকর্ষণ ব্যক্তিত্বে আমরা সবাই শাচৌ হতে চেয়েছিলাম।

আমি মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি। দেখিনি সত্তর দশকে বিচিত্রার সেই প্রবল প্রতাপশালী উত্থান, যখন বিচিত্রার প্রতিটি লেখাই অসম্ভব সাহসী, নতুন চিন্তার খোরাক কিংবা পরবর্তীতে গবেষণার বিষয়। নব্বই সালের শেষে আমি যখন বিচিত্রায় কাজ করার সুযোগ পাই তখন পরিস্থিতি অনেকখানি থিতু। বিচিত্রার উত্থানের কাহিনী শুনতাম শাচৌর কাছে। বলতেন বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে তার বিক্ষিপ্ত কিন্তু সুস্পষ্ট ভাবনাগুলো।

সে কাহিনী একজন সাহসী, ডায়নামিক সম্পাদকের এগিয়ে চলার চৌকস বর্ণনা। সরকারি ট্রাস্টের কাগজ হলেও শাহাদত চৌধুরীর কারণে বিচিত্রার ছিল স্বতন্ত্র পরিচয়। স্বাধীনতাবিরোধী, ভন্ড রাজনীতিক, ঋণখেলাপি, কালোবাজারি, ঘুষখোরসহ সমাজের সব খারাপের প্রতিপক্ষ বিচিত্রা। আর এই অবস্থানের ধারাবাহিকতা ছিল এর প্রকাশনার শেষ দিন পর্যন্ত।

শাহাদত ভাই তার ব্যক্তিত্ব দিয়ে মানুষকে কাছে টানতে জানতেন। আর তাই শা চৌর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিল বিচিত্রা কিংবা পেশাগত গন্ডির চেয়েও অনেক বাইরে। প্রেম, ভালোবাসা, ঘৃণা কিংবা প্রতিবাদ সবকিছুতেই শাচৌ স্বতন্ত্র অভিব্যক্তির কথা বলতেন। আমরাও মন খুলে তার সঙ্গে যে কোনো ব্যক্তিগত বিষয়ে কথা বলতে পারতাম।

মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকা ও সাহসী সাংবাদিকতা শিখেছি শাচৌ'র কাছে। তিনি বলতেন, সাংবাদিককে হতে হবে সৎ, আদ্যন্ত সৎ। এতে থাকবে না স্বপ্ন কিংবা বাণিজ্যের বেসাতি। সারাটা সমাজ যদি হয় প্রতিপক্ষ আর আত্মজের মতো বন্ধুরা অটল বৈরী তবুও সাংবাদিক একচুল নড়বে না তার আদর্শ থেকে।

শাহাদত ভাই তার পুরো জীবন এ আদর্শের পক্ষে লড়াই করে গেছেন। তিনি নিঃসন্দেহে এ দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পাদক।

আজ দেশে অনেক দৈনিক পত্রিকা। প্রতিদিন বেরুচ্ছে অসংখ্য সাময়িকী, বিষয় নির্ভর প্রকাশনার এসবেরই শুরু হয়েছিল বিচিত্রায়। আজ থেকে দু'দশক আগে। স্বল্প পরিসরে, কিন্তু একেবারেই প্রথম হিসেবে।

শাহাদত ভাই ভালোবাসতেন প্রকৃতি। ভালোবাসতেন আমাদের মাটি ও মানুষকে। তার শেষ শয্যায়ও ব্যতিক্রম নেই। তিনি শুয়ে আছেন মিরপুরের লাল মাটিতে। মাথার ওপর ছায়া দিচ্ছে একটি খেজুর গাছ। আর পাশেই দিগন্ত বিস্তৃত তেপান্তরের মাঠ। সে মাঠে বিকেলে খেলতে আসে এলাকার শিশু-কিশোর- আগামী প্রজন্ম। মাঠ, পেরিয়ে আছে বিশাল এক দীঘি যার স্নিগ্ধ বাতাস প্রাণ জুড়ায় চারপাশের সবাইকে।

চোখ বন্ধ হয়েছে শাচৌ'র। কিন্তু মনের জগতে এখনো তিনি আছেন। হয়তো থাকবেন চিরদিন। বেঁচে থাকবে তার স্বপ্নগুলোও।

একজন নায়ক সম্পাদকের অবয়ব

শামীম আজাদ

বাংলাদেশে সংবাদপত্র জগতের একজন সম্পাদক হয়েও যিনি পপ স্টারের মত জনপ্রিয়তা পেয়েছেন- ভক্ত ও বুদ্ধিজীবী পরিবৃত থেকেছেন, প্রশাসনের ভীতি ও শ্রদ্ধা মিশ্রিত চাহনিকে উপভোগ করেছেন এবং একটি ঘটনাবহুল গ্ল্যামারাস জীবন যাপন করে নিজের জীবনের প্রাক-আধুনিকতা' সাপ্তাহিক বিচিত্রার মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছেন গোটা বাংলাদেশে সেই বিরল ক্ষণজন্মা সম্পাদক শাহাদত চৌধুরীর পার্থিব জীবনের অবসান হয়েছে। খবরটি পাবার পর পরই মনে ভেসে উঠছে 'বিচিত্রার' অবয়ব। না আজকের বিচিত্রা নয় আমি সেই লুপ্ত এবং খাটি বিচিত্রার কথা বলছি- আমি তার সম্পাদকের কথা বলছি। মানুষ নিজেকে দিয়েই সময়কে চিহ্নিত করে। আমিও করছি।

> জীবণে খ্যাতি ও শরীর দুটোকেই অযত্ন করেছেন বড়। অবলীলায় বিলিয়েছেন মেধা ও শক্তি। বড় বড় অস্ত্রোপচারের পরও থেকেছেন উদাসীন। সেলিনা চৌধুরীর মত নারী তার স্ত্রী না হলে আমরা তার কাছ থেকে এত বিশাল পরিমাণ পেতে পারতাম না।

আমি বলছি আমার সাংবাদিক জীবনের গুরুর কথা। আমি বলছি আমাদের 'বিচিত্রার' স্বর্ণ সময়ের কথা। যে সময় শাহরিয়ার কবির, আলমগীর রহমান, কাজী জাওয়াদ, চিন্ময় মুৎসুদ্দি, মাহমুদ শফিক, চন্দন সরকার, লুৎফুল হক, আহমেদ আলী প্রমুখের টিম নিয়ে যে সম্পাদক তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ক্ষিপ্রতায় অবিরাম সংবাদ মাঠে গোলের পর গোল দিয়ে গেছেন -তার কথা। যেখানে মাঠের বাইরে থেকে এসে হাত লাগাতেন রনবী, আনু মুহম্মদ। আমি বলছি আমার সেই তারকা কোচ সম্পাদকের কথা- যিনি আমাদেরকে মাঠে নামিয়ে ক্ষণকালের জন্য কোনোদিন চা খেতে চলে যাননি। কভার স্টোরির বীজ বপনের পর থেকে তা প্রশবিত না হওয়া পর্যন্ত লেগে

থাকতেন একাগ্র পরিচর্যায়। কিভাবে কলম খেলিয়ে সমুন্নত রাখতে হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মগজ থেকে চেছে ফেলতে হবে বাংলাদেশের মান্ধাতা আমলের চিন্তাভাবনা, অভ্যাস পাল্টাতে হবে খাদ্যের ও পোশাকের, মুখ ফেরাতে হবে প্রাকৃতিক সবুজে, নারী হত্যা বন্ধে সজোরে বলতে হবে 'স্টপ ফেমিসাইড', পাঠকদের সাথী করে আরো শক্তিশালী হয়ে ব্যক্ত করতে হবে অবিরাম মঙ্গল মতবাদ, হয়ে উঠতে হবে বিচিত্রার নির্ভীক কলম সৈনিক তা তিনি ধরে ধরে শিখিয়েছেন। প্রতিদিন লেখার অগ্রগতির খবর নেয়া দিয়ে শুরু করে স্টোরির ছবি সংগ্রহ বা তোলার ব্যাপার, ড্রাফ্ট পড়া ও নিজে কোনো পরিবর্তন না করে অত্যাবশ্যকীয় অনুপানের ইঙ্গিত দেয়া এবং ফাইনালি প্রুফ আমাকে দিয়েই দেখিয়ে ক্ষান্ত থাকেননি। ঘর্মাক্ত হয়ে পাখা বন্ধ ঘরে সিলোফেনের স্টোরির মেকাপ যখন করেছি- তিনি ঠিকই এসে একবার ঘুরে গেছেন। কাজ শেষ হলে প্রিন্স থেকে বিরিয়ানি খেয়ে ভেবেছি, এবার ক'দিন স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারবো। কিন্তু তা হয়নি। এমনকি সফল কভারস্টোরির পরও তার কাছ থেকে চাপের কমতি হয়নি। তখনই হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন পরবর্তী ফলোআপ।

মনে পড়ে বাংলাদেশে 'ফ্যাশন' শব্দটি প্রথম এবং যথাযথ ব্যবহার করে আমরা যখন তা জাতীয় পর্যায়ে তুলে এনেছি, পাগল হয়ে অন্যান্য পত্রিকাও দেশের কাপড়, দেশের স্টাইল ও দেশের ডিজাইনার খুঁজে পেতে ফ্যাশন লিখতে শুরু করেছে আর আমি কিনা মহাতুপ্তির ঢেঁকুর তুলতে গেছি- তিনি শান্তি দিলেন না। তকনই বসে গেলেন ব্রেন স্টর্ম নিয়ে- শুরু হয়ে গেল পাঠক জরিপ আর ভাবনা চিন্তায় 'ঈদের বাজার' স্টোরির প্রক্রিয়া ও কাজ। সম্পাদকের ঘর থেকে ছুটে বেরিয়েই আমি বসেছি আমার টিম: আরিফ রহমান শিবলী, এমদাদ হক, করভী মিজান, জসিম মল্লিক প্রমুখকে নিয়ে। ওর্য়াক হলিক শাহাদত চৌধুরীর বাণীকে মোক্ষ জ্ঞানে সেদিন আমরা ছুটে বেরিয়েছি বেইলী রোডের টাঙ্গাইল কুটিরের মনিরা এমদাদ থেকে মিরপুর, গুলশান, বনানী হয়ে শীতলক্ষ্যা পাড়ের তাঁতি আখতার মিঞার বেড়ার ঘরে। ফ্যাশনের নামে দেশী এবং নিতান্তই আমাদের খাঁটি ব্যাপারগুলো ছড়িয়ে পড়েছিলো বাংলাদেশের জেলায় জেলায়। আর ব্যক্তিগতভাবে বিচিত্রার স্বর্ণযুগের এই তারকার কুচো মাত্র ভাগ আমার জীবন দিয়েছিলো পাল্টে। সেই অযুত শক্তিতে আমি

বিচিত্রা'র সহকর্মীদের সঙ্গে নৌবিহারে

বিলেতের বিপরীত বাতাসে তবু টিকে আছি। করেছি দু'দুবার দেশের পোশাকের প্রর্দশনী। কর্মী ছিলাম এদেশে প্রথম বাংলাদেশী মেলা দেশ-বিকালের সঙ্গে। তার কাছেই শিখেছি যত দূরেই যাই না কেন- সেই শজিনার ডাঁটার সুগন্ধ, দুগ্ধবতী গাভী আর সম্পন্ন বাংলাদেশের অবয়ব প্রস্ফুটিত রাখতে।

তার জ্ঞানের অতলতা, সাহসের পরাকাষ্ঠা, কর্মক্ষতার সীমাহীনতা, কৌতূহলের অপরিমেয়তা যে কোনো নবীন সাংবাদিককে ভীত-সন্ত্রস্ত করবার জন্য যথেষ্ট হলেও তা কখনো হয়নি। বরং চির তরুণ শাহাদত চৌধুরীর চনমনে ব্যক্তিত্বে আঠার মত লেগে থেকেছেন নতুনরা। 'বিচিত্রা' বন্দ হয়ে গেলে বের করেন 'সাপ্তাহিক ২০০০'। শাহাদত চৌধুরী নামের এ তারাটি তার কণামাত্র উজ্জ্বলতা যাদের দিতে পেরেছিলেন অথবা ঘুরিয়ে বললে তার কাছ থেকে সাহচর্য, শিক্ষকতা, সম্পাদনা ও উপদেশ থেকে যে কণামাত্র ভাগ আদায় করে কাজে লাগাতে পেরেছে সেই জ্বলে উঠেছে ফুলকির হয়ে। অলেখক লেখক হয়েছেন, প্রতিষ্ঠিত লেখক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ পেয়েছেন, তারকাবিহীন সে সময়ের বাংলাদেশে তৈরি হয়েছে অনেক তারকা- টিভি, চলচ্চিত্র নির্বশেষে। নিজ কর্ম ও দেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা আছে, আছে একাগ্রতা। এমন কোনা সাধারণ রাজনীতিবিদ, সমাজ সংস্কারক, গবেষক, নারী কর্মী, ফ্যাশন ডিজাইনার, শিল্পী, অর্থনীতিবিদ, স্থপতি, শিক্ষক বা সাংবাদিক যেই হোন না কেন- শাহাদত চৌধুরীর ছোঁয়ায় জ্বলে উঠেছেন, হয়েছেন অসাধারণ। দেশের উন্নয়নের অযুত সংকল্প তাকে নতুন তৈরির কঠিন কাজে আজীবন রেখেছে নিষ্ঠ। শাহাদত চৌধুরী ছিলেন একজন অগ্রসর ও আধুনিক সম্পাদক, যিনি প্রতি সপ্তাহে বিচিত্রার বিষয়ের নিত্য অভিনবত্বে কভারের পর কভার আপ্লুত করেছেন এবং পরবর্তী ইস্যুর জন্য পাঠককূলকে উদ্দীপিত ও কৌতূহলি করে রেখেছেন। তার সত্যবাদিতার দাপটে প্রতিটি সরকার থেকেছে তটস্থ, বিচিত্রার দিকর্নিদেশিকা চকমকি কাঠির সঞ্চালনে গতিপথ পাল্টেছে সরকারি নীতিমালার। একাত্তরের রণাঙ্গনের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা ও দেশপ্রেম বুকের ভেতরে জ্বালিয়ে ছিলেন অনির্বাণ। তার কর্মে হয়েছে তারই অনুবাদ। ব্যক্তিত্বের চৌম্বকীয় আকর্ষণে বার বার নবীন-প্রবীণ সবাই ফিরে ফিরে গেছেন তার কাছে। কর্তৃপক্ষ বা সরকারের সঙ্গে কখনো করেননি সমঝোতা। বার বার মামলা হয়েছে তার নামে। হাজিরা দিয়েছেন- লড়েছেন নিজের নীতিতে অটল থেকে।

জীবণে খ্যাতি ও শরীর দুটোকেই অযত্ন করেছেন বড়। অবলীলায় বিলিয়েছেন মেধা ও শক্তি। বড় বড় অস্ত্রোপচারের পরও থেকেছেন উদাসীন। সেলিনা চৌধুরীর মত নারী তার স্ত্রী না হলে আমরা তার কাছ থেকে এত বিশাল পরিমাণ পেতে পারতাম না। সেলিনা তার কর্মের সঙ্গে, তার কর্মীদের সঙ্গে, সর্বোপরি তার সঙ্গে যেকোনো অপ্রত্যাশিত উদ্যমে দাঁড়িয়েছেন পাশাপাশি। দু'টি মেয়ে সাশা ও এষা বড় হয়েছে আমার সন্তান সজীব ও ঈশিতার এবং বিচিত্রার বন্ধুদের ছেলে মেয়েদের টুপুল, পলা, টুকির সঙ্গে 'বিচিত্রার' ঘরে। বিচিত্রা পরিবারের এইসব ছেলেমেয়েরা ছড়িয়ে পড়েছে দেশে ও বহির্বিশ্বে তার হাতে মাখানো বাংলাদেশের সবুজ লাল নিয়ে। হয়তো সে রঙ ছড়িয়ে যাবে সবখানে।

কিন্তু দেশের বড় দুঃসময়ে চলে গেলেন দেশেরই এক অনন্য সাধারণ সন্তান। যে বিচিত্রা একদিন সময় থাকতেই রাজাকারের পুনরুত্থান নিয়ে সর্বপ্রথম সর্তক বাণী করেছিলো এবং অব্যাহতভাবে তথ্য সরবরাহ করে যাচ্ছিল কিন্তু কোনো সরকারই কান দেয়নি। বরং তারা আঁতাত করেছে স্বাধীনতা বিরোধীদের সঙ্গে। সময় এবং সুযোগে সেই সব শয়তানরা ধর্মভেকধারীরা এখন বাংলাদেশে দন্ড ঘোরাচ্ছে। গোড়ামির হিজাবে হিজাবে ঢেকে যাচ্ছে মুক্ত নারীর চেহারা। দেশের চাকা অস্তাচলের দিকে নিয়ে চলেছে যারা তাদের জন্য জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বহুমুখী শাদাদত চৌধুরী ছিলেন এক বীর মুক্তিযোদ্ধা। দেশের প্রতি তার আর কোনো দায় বাকি নেই। আজ আমার মনে হচ্ছে হতভাগ্য দেশপ্রেমিকদের আর কোনো হেনস্থা দেখার আগেই সৌভাগ্যবান তিনি চলে গেলেন। কিন্তু তার সে জীবন স্বল্প সময়ের হলেও ছিলো একজন দেশকর্মীর পূর্ণাঙ্গ জীবন।